কালের কণ্ঠ

তারিখ 18 FEB 2016
পৃষ্ঠা ৭৬ কলাম ১

এ কে এম শাহনাওয়াজ ▷

মাতৃভাষা ভাবনার ফেব্রুয়ারি

প্রভাতফেরি, শব্দটি শুধু একুশের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বাঙালি সংস্কৃতির এ যেন প্রতীকী শব্দ। বাঙালি সংস্কৃতিতে দিনের হিসাব প্রত্যূষ থেকে সন্ধ্যা। তাই একুশের প্রথম প্রহর প্রত্যূষে নগ্নপায়ে একুশের গানের সুর-মূর্ছনায় শহীদ মিনারে যাওয়ার আলাদা রোমাঞ্চ ছিল। কিন্তু একপর্যায়ে সামরিক ও সামরিক মদদপুষ্ট শাসকরা নিজ নিরাপত্তার প্রশ্নে পাশ্চাত্যের হিসাবে মধ্যরাতে একুশের প্রহর গুনতে শুরু করেন। মুখরিত করেন শহীদ মিনার

একুশে আমাদের জাতীয় অহংকার হলেও একুশের মূল চেতনা থেকে আমরা ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছি প্রধানত সংস্কৃতিবোধ ও ইতিহাসচেতনা বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে। ভাষা আন্দোলনের পর ৬০ বছর পেরিয়ে গেলেও বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির যতটুকু বিকাশ ঘটার কথা ছিল তার অল্পই ঘটেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অপূর্ণ স্বাজাত্যবোধের কারণে ভূতের পায়ে হেঁটে পিছিয়েও গেছে। এমন কথাও চলে আসছে যে বিশ্বায়নের যুগে বাংলা ভাষাচর্চা অত জরুরি কেন? এখন বিশ্ব সংস্কৃতির জোয়ারে গা ভাসাব—বাঙালি সংস্কৃতি নিয়ে পড়ে থাকা কেন? ফলে একই দেশে তিন-চার ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা অসম প্রতিযোগিতায় এগোচ্ছে। এই জগাখিচুড়ির মধ্যে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতি। স্পষ্টতই চারটি শিক্ষাধারা এখন প্রচলিত। মূলধারার বাংলা মাধ্যম স্কুল, ইংরেজি মাধ্যম স্কুল, আলিয়া ধারার মাদ্রাসা শিক্ষা ও কওমি ধারার মাদ্রাসা শিক্ষা। আগে বাংলা মাধ্যম স্কুলগুলোর পাঠ্যক্রম ও পরিচর্যায় বাংলাচর্চায় ছাত্র-শিক্ষক উভয়ের সচেতনতা যতটা ছিল, এখন আর তেমনটি নেই। এসএসসি ও এইচএসসির ফলাফলে এ প্লাস বা স্বর্ণখচিত এ প্লাস পাওয়ার প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকরা শুদ্ধ বানান ও ভাষায় বাংলাচর্চার দিকে মনোযোগ দেওয়ার সময় পাচ্ছেন না। তাই দীর্ঘ প্রতিযোগিতায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া মেধাবী ফল করা ছাত্রছাত্রীরা যখন ভুল বানান আর দুর্বল বাক্য গঠনে উত্তরপত্র লেখে তখন বোঝা যায় সংকটটি কোথায়। আমার মতো মাঝবয়সী অনেকেই স্মরণ করতে পারবেন, শুদ্ধ বানান আর বাক্যে বাংলা-ইংরেজি লেখাটা স্কুলই শিখিয়ে দিত। এখন এসবের ধার ধারে না কেউ। এক পৃষ্ঠা ইংরেজি লেখায় একটি শব্দের বানানে 'ই'-এর বদলে 'এ' হয়ে গেলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়। এমন ছাত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েন শিক্ষক-অভিভাবক। অন্যদিকে বাংলা বানান পাঁচটা ভুল করলেও অর্ধেকটা মাত্র চোখে পড়ে শিক্ষকের। বাংলা বানানে ভুল আর বাক্য গঠনে সাধু-চলিত মিশে গেলেও তা গর্হিত অপরাধ নয় জেনে শিক্ষার্থী অবিচল থাকে। এ কারণে বর্তমানে শিক্ষকতায় আসা (স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত) তরুণ শিক্ষকদের একটি বড় অংশের বাংলা ভাষা আর বানানের দুর্বলতা তাঁদের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পল্লবিত হচ্ছে। অন্যদিকে বিশ্বায়নের অপূর্ণ ব্যাখ্যায় আর চারপাশের ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষার দাপটে মূলধারার বাংলা মাধ্যমে পড়া শিক্ষার্থীরা এক ধরনের হতাশা ও বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে না ঘরকা না ঘাটকা দশায় পৌঁছেছে।

ইংরেজি মাধ্যমে স্কুলপড়ুয়া শিক্ষার্থীরা বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে দ্রুতই। দেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতি শেখার তেমন অবকাশ নেই এদের পাঠ্যক্রমে। বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন এই প্রজন্মের অনেকেই। অদ্ভুত বিষয় হচ্ছে, এই ধারার শিক্ষার্থীরা তাদের পাঠ্যক্রমবিন্যাসের দুর্বলতার কারণে যতটা ভালো ইংরেজি বলতে পারছে ততটা ভালো দখল দেখাতে পারছে না ইংরেজি ভাষা ও গ্রামারে। বিশেষ করে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন এদের মধ্যে দেশাত্মবোধ তৈরি হওয়াটা খুব কঠিন।

আলিয়া ধারার মাদ্রাসা শিক্ষা বাংলা মাধ্যম মূলধারার সঙ্গে অনেকটাই সম্পর্কিত। তাই বাংলা মাধ্যম শিক্ষার অনুরূপ সংকট এই অঞ্চলেও রয়েছে। তবে সবচেয়ে বড় সংকটে আছে কওমি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা। এ দেশের মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের এক-তৃতীয়াংশ কওমি মাদ্রাসায় পড়ে। আরবি, ফারসি ও উর্দু কওমি মাদ্রাসার শিক্ষা মাধ্যম। বাংলা ও ইংরেজির সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। দেশ, জাতি ও জাতীয় ঐতিহ্য সম্পর্কে এ অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের অনেকের ধারণাই খুব অস্পষ্ট। তারা নিজেদের এবং দেশ ও সমাজের বোঝায় পরিণত হচ্ছে। একটি জাতির সংস্কৃতি তার ভাষার বাহনে চড়ে ছড়িয়ে পড়ে। ভাষা হারিয়ে ফেললে প্রজন্ম সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। ফলে যেকোনো অশুভ শক্তি আজ্ঞাবহ দাসে পরিণত করতে পারবে সহজেই। পাকিস্তানি শাসকচক্র এ সত্য ১৯৪৭ সালেই বুঝেছিল। তাই বাংলা ভাষার ওপরই প্রথম আঘাত হানে। আমাদের পূর্বসূরিরা আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষা করে আত্মপরিচয়কে সমুন্নত রাখতে পেরেছিলেন। কিন্তু চৈতন্য-বিচ্ছিন্ন আমরা নানাভাবে একে লালন করতে ব্যর্থ হচ্ছি। এক ধরনের উগ্র আধুনিকতা ও অপূর্ণ বৈশ্বিক ভাবনা ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাজার অর্থনীতির বিকৃত ধারণা থেকে আমরা বাঙালি সংস্কৃতির বিকলাঙ্গ অবয়ব উপস্থাপন করছি। আমাদের চারপাশে অর্থবিত্তে আভিজাত্য খোঁজা অনেক পরিবারকেই পাওয়া যাবে যাদের বাংলা ভালো বলতে না পারা বা লিখতে না পারার মধ্যে এক ধরনের অহমিকার ছোঁয়া থাকে। এক টেলিভিশন চ্যানেলে বছর কয়েক আগে একটি অনুষ্ঠান দেখেছিলাম। রাজধানীর কোনো এক ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের খুদে শিক্ষার্থীদের সাক্ষাৎকার নিচ্ছিলেন রিপোর্টার মেয়েটি। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তাদের যে কোনো ধারণাই নেই তা ক্রমেই স্পষ্ট হচ্ছিল। টোয়েন্টি সিক্সের বাংলা কী—অমন প্রশ্নের উত্তরে অসহায় হয়ে পড়ল শিক্ষার্থী। আমার এক ছাত্রীর কথা মনে করতে পারি। বাঙালি ঘরের মেয়েটি দেশে-বিদেশে ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশোনা করেছে। তখন দেশের সেরা এক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ত। এই সুবাদে আমার কাছে কয়েকটি রেফারেন্স বইয়ের নাম জানতে চাইলে আমি ইংরেজি ভাষায় লেখা কয়েকটি বইয়ের সঙ্গে একটি বাংলা ভাষায় লেখা বইও দেখার জন্য বললাম। আমি চমকে উঠলাম ওর অসহায় দৃষ্টি দেখে। আমাকে বিস্মিত করে বলল, ও বাংলা পড়তে পারে না। অর্থাৎ ওকে বাংলা পড়া শিখতে হয়নি।

আমার প্রয়াত শিক্ষক খ্যাতিমান ইতিহাসবিদ, সাবেক অর্থমন্ত্রী ড. এ আর মল্লিক ক্লাসে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে একটি গল্প বলেছিলেন। প্রতি ফেব্রুয়ারিতে গল্পটি নতুন করে মনে পড়ে আমার। মুক্তিযুদ্ধের আগে থেকে স্যার মোহাম্মদপুরের বাসিন্দা ছিলেন। সে সময়ে তাঁদের বাসায় এক বিহারি ভিক্ষুক আসতেন। ভিক্ষা চাইতেন তাঁর প্রতিদিনের ভাষা উর্দুতে। মুক্তিযুদ্ধের পর একদিন স্যারের দরজায় সেই বৃদ্ধ ভিখারি। যথারীতি উর্দুতেই ভিক্ষা চাইছেন। আমার মুক্তিযোদ্ধা স্যারের কাছে এবার বিসদৃশ লাগল। তিনি বললেন, বাংলায় ভিক্ষা না চাইলে তিনি ভিক্ষা দেবেন না। এবার অসহায় হয়ে পড়লেন ভিক্ষুক। উপসংহার টানলেন স্যার। বললেন, 'ও বেচারা হয়তো ঢাকায় কাটিয়ে দিয়েছে জীবনের সবচেয়ে বড় সময়। কিন্তু জীবনযাত্রার কোনো পর্যায়েই তার বাংলা শেখার দায় পড়েনি। ভাঙা-আধাভাঙা উর্দুতে তাকে সাহায্য করেই আমরা গৌরব বোধ করেছি। অর্থাৎ আমরা আমাদের আত্মমর্যাদাবোধকেই যেন খুঁজে পাইনি।'

সামাজিক জীব হিসেবে বসবাস করতে হয় বলে নিজের নেওয়া শপথ নিজেকেই ভাঙতে হয় বারবার। বাঙালি পরিবারের বিয়ে ধরনের সামাজিক অনুষ্ঠানে ইংরেজি ভাষায় দাওয়াতপত্র পেলে তেমন অনুষ্ঠানে যাব না ভাবলেও যেতে হয়। এই প্রবণতা ইদানীং অনেক বেড়ে গেছে। ব্যবসায়ী, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, আমলা, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব থেকে শুরু করে সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারও ইংরেজিতে দাওয়াতপত্র লিখে আত্মপ্রসাদ লাভ করে। আমাদের সমাজ বাস্তবতায় বিয়ে অনুষ্ঠানে শিক্ষিত-স্বল্পশিক্ষিত নানা স্তরের আত্মীয়কে দাওয়াত দিতে হয়। একসময় দেখতাম ডাকঘরে অশিক্ষিত মানুষের চিঠি লিখে দেওয়ার জন্য পয়সার বিনিময়ে লেখক থাকত। এখন বোধ হয় বিয়ের দাওয়াতপত্র পড়ে দেওয়ার জন্য আরেকটি পেশা সৃষ্টি হতে পারে। বেশ কয়েক বছর আগের কথা। তখন সরদার ফজলুল করিম স্যার বেঁচে ছিলেন। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতেন ক্লাস নিতে। স্যারকে একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম, এক বাঙালি আরেক বাঙালিকে তার সামাজিক অনুষ্ঠানে ইংরেজিতে দাওয়াত করেন কেন? মৃদু হেসে স্যার বলেছিলেন, 'এটি এক ধরনের শ্রেণি-চরিত্র। অর্থবিত্ত বা অবস্থানে সে যে একটু উঁচুতে, তা প্রকাশের একটি সুযোগ খোঁজে এখানে। এ ধারার সবাই এই শ্রেণিভুক্ত হতে চায়।'

প্রজন্মকে স্বাজাত্যবোধ থেকে দূরে সরাতে আমাদের টিভি চ্যানেল, আর বেসরকারি রেডিও কম কসরত করছে না। তরুণ প্রজন্মের উদ্দেশে তৈরি অনেক অনুষ্ঠানে উপস্থাপক 'প্রিয় দর্শক'-এর বদলে 'হাই ভিউয়ার্স' বলে হাত-পা ছুড়ে মাঝেমধ্যে অদ্ভুত উচ্চারণে ইংরেজি শব্দ বলে এক অদ্ভুত খিচুড়ি বানাতে থাকে। গাড়িতে চলার সময় ড্রাইভার প্রায়ই এফএম ব্যান্ডের